সংবাদ

তারিখ ... 3 NOV 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক পরিপত্র : একটি পর্যালোচনা

মো. বজলুর রহমান আনছারী

মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের এক আদেশের প্রেক্ষিতে ২০ জুন ২০১২ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিংবাণিজ্য বন্ধে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ নামে পরিচিত। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ নীতিমালা প্রণীত হলেও এটি বাস্তবায়িত হলে আমাদের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের হাত থেকে রক্ষা পাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করার সুবাদে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে জাতীয় পত্রপত্রিকায় লেখালেখির অভ্যাস গড়ে ওঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন নীতিমালা বা পরিপত্রের প্রতি আমার কিছুটা দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। জানিনা আমার এ লেখা পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বেই এটির সংশোধনী আদেশ জারি হয় কি-না? তবে আমার বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অচিরেই এটির একটি সংশোধনী আদেশ জারি করবেন। ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পরিপত্র বা নীতিমালা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করা হলেও অনেক নীতিমালা বা পরিপত্র এখনও পূর্ণাঙ্গতা পায়নি।

দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৮ ভাগই বেসরকারি পর্যায়ের। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের শতভাগ সরকার বহন করলেও শিক্ষক নিয়োগ, চাকরিচ্যুতিসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্থানীয় পরিচালনা কমিটির ওপর। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই দীর্ঘদিনের চালু থাকা ম্যানেজিং কমিটি গঠন বিধিমালা বাতিল করে ৮ জুন ২০০৯ একটি নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করেন। যা গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধিমালা নামে পরিচিত। এটি জারির পর দুয়েকটি সংশোধনী আনা হলেও অনেক অনুচ্ছেদে অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা রয়েছে। 'ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রবিধিমালা সংশোধন সম্পর্কে' আমার একটি লেখা ২১ মার্চ ২০১২ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিলম্বে হলেও সরকার এটি সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম যে, বিদ্যমান বিধিমালা সংশোধনকল্পে শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ২৯ আগস্ট ২০১২ সচিবালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আশা করা যায়, বিধিমালাটি অচিরেই সংশোধিত আকারে জারি হবে।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রধানের শূন্য পদে দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বে কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা ছিল না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এক ধরনের বিশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করছিল। বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের শূন্য পদ : প্রয়োজন সুস্পষ্ট নীতিমালা' শিরোনামে আমার একটি লেখা ২৩ মে ২০১১ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে ৬ জুন ২০১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্ব পালন বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করে। কলেজ ও মাদ্রাসা এ পরিপত্রের আওতাবহির্ভূত থাকায় অবশেষে ৯ জুলাই ২০১২ অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্ব পালন বিষয়ে সংশোধনী আদেশ জারি করে। কিন্তু এ সংশোধনী আদেশে মাদ্রাসাকে অন্তর্ভুক্ত না করায় আশা করা যায় শীঘ্রই এটির আবারও সংশোধনী আদেশ জারি হবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ জারি হলেও প্রায় সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ১৮ মে ২০১০ সালে জনবল কাঠামোর সংশোধনী আনা হয়। সংশোধনীতে বলা হয়, 'সকল পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্ত ইনডেক্সধারী শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বিবেচিত হবেন।' ২৭ আগস্ট ২০১২ এটি আবারও সংশোধিত আকারে জারি করা হয়েছে। যদিও বিগত আড়াই বছরে ছোটখাটো কয়েকটি সংশোধনী আনা হলেও সংশোধিত এ নির্দেশিকায় শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তিত এ নির্দেশিকার ১১:১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণী/সমমান থাকতে হবে।' আবার অনুচ্ছেদ ১১:২ এ বলা হয়েছে যে, 'এ নির্দেশিকা জারির পর এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোর পরিশিষ্ট-'ঘ'-তে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ব্যতীত কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।' অথচ পরিশিষ্ট-'ঘ'-এ বর্ণিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব পদের শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ যোগ্যতার কোথাও শিক্ষাগত যোগ্যতার সব পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণী/সমমান থাকতে, হবে-এটির উল্লেখ নেই। তবে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উভয়টিতে তৃতীয় বিভাগ থাকলেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বিবেচিত হবেন-মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি যখন মাঠ পর্যায়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। ঠিক তখনই প্রায় এক মাসের মধ্যেই গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে ১১:১৬ ও ১১:১৮ অনুচ্ছেদ এর সংশোধনী এনে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার সব পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণী/সমমানের পরিবর্তে সমগ্র শিক্ষাজীবনে একটি তৃতীয় শ্রেণী/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবশেষে গত ১৫ অক্টোবর ২০১২ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা কর্তৃক জনবল কাঠামোর পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিমার্জনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রণীত জনবল কাঠামো এবং এর সংশোধনীসমূহ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। আবার ২০ জুন, ২০১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা-১৪ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রে দাখিল মাদ্রাসায় কর্মরত ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/ সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের সুযোগ দেয়া হলেও বিদ্যালয়ে কর্মরত ধর্মীয় শিক্ষকের ক্ষেত্রে মাদ্রাসার সুপার/সহসুপার পদে নিয়োগ লাভের সুযোগ দেয়া হয়নি। এভাবে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে ঘন ঘন পরিপত্র জারি করা হয়েছে এবং অনেক পরিপত্র এখনও পূর্ণাঙ্গতা পায়নি।

১২ জুলাই ২০১২ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা-১৩ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকরী তদারকি টিম গঠন সংক্রান্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ও পরিবেশ তদারকির কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই। এ পত্রটির সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের আঞ্চলিক উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন বিষয়ে; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯ আগস্ট ২০০৮ জারিকৃত আদেশটি সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। কেননা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির প্রতিনিধি হিসেবে আঞ্চলিক উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও তাঁর অধস্তন কর্মকর্তারা শিক্ষার মান ও পরিবেশ তদারকিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। নিয়মিত একাডেমিক ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের ফলে ইতোমধ্যেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে তেমনি সরকারের কাছে এসব প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতাও সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া এসইএসডিপি শীর্ষক প্রকল্পের কর্মকর্তারাও শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করছেন। ১২ জুলাই জারিকৃত পত্রটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করারই শামিল। প্রায় ৩ মাসের মধ্যেই এটির সংশোধনী আদেশ জারি করে কার্যকরী তদারকি টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে। এ জাতীয় বহু অস্পষ্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ পরিপত্র বা নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। ফলে বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

লেখাটি মূলত শুরু করেছিলাম শিক্ষকদের কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা নিয়ে। নীতিমালা জারির বয়স প্রায় ৪ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও দেশব্যাপী পুরোপুরি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে- এমন সংবাদ শোনা যায়নি। তবে কোথাও কোথাও এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে- যা পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়। নীতিমালায় মাঠ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতামত অনেকাংশেই অনুপস্থিত ছিল। যা বিদ্যমান অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা থেকে প্রমাণিত হয়। নীতিমালাটি পুরোপুরি বাস্তবায়নে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে- সেটি হয়তো একটু পরের বিষয়। তবে অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতাসমূহ দূরীভূত করা না হলে এটির পুরোপুরি বাস্তবায়ন শুরুতেই বাধাগ্রস্ত হবে। কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালায় কোচিং ও কোচিং বাণিজ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- কোচিং : 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকের নির্ধারিত ক্লাসের বাইরে বা এর পূর্বে অথবা পরে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে/বাইরে কোন স্থানে পাঠদান করাকে কোচিং বুঝাবে।' কোচিংবাণিজ্য : 'বিভিন্ন জাতীয়/দৈনিক/ স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার দেয়াল লিখন অথবা অন্য কোন প্রচারণার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে বুঝাবে।'

সংজ্ঞানুযায়ী কোচিং ও কোচিংবাণিজ্য এক জিনিস নয়। নীতিমালায় প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং ও কোচিং বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও শুধুমাত্র কোচিংবাণিজ্যে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ-১৪ এ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তাছাড়া কোচিংবাণিজ্য বিষয়টি শিরোনামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও প্রাইভেট টিউশনি এবং কোচিং শিরোনামের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং শাস্তির আওতাবহির্ভূত। অনুচ্ছেদ- ১ : জ এ বর্ণিত প্রাইভেট টিউশনির সংজ্ঞানুযায়ী অনুচ্ছেদ-৩ এ কোন শিক্ষক অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের সীমিতসংখ্যক [১০ জনের বেশি নয়] শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না- একথাটি সরাসরি নীতিমালার কোথাও উল্লেখ নেই। তবে এ অনুচ্ছেদে নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না- এমন নির্দেশনা রয়েছে। নীতিমালায় কোচিংবাণিজ্য একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। অনুচ্ছেদ- ২ : খ এ অতিরিক্ত ক্লাসের যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে- এ ধারণাটি নতুন হলেও শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে পড়ানোকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন তা মূলত কোচিং এরই নামান্তর। এটি মাধ্যমিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাস্তবায়ন অনেকাংশেই কঠিন। কোন শিক্ষক ইংরেজি, গণিত বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় প্রাইভেট পড়াতে যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন; ১৫০ টাকার বিনিময়ে উপজেলা বা মফস্বল এলাকায় অতিরিক্ত ক্লাসে সময় দিতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন না। তাছাড়া কোন শিক্ষক কখন কাকে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা মনিটরিং কমিটির পক্ষে তদারকি করাটাও কঠিন। ধারণা করা হচ্ছে কোর্টের রায় বাস্তবায়নে অনেকটা তড়িঘড়ি করেই এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি বাস্তবায়নোপযোগী করতে হলে এটি অবশ্যই পরিমার্জন করা প্রয়োজন।

সময়ের প্রয়োজনে এবং যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে যে কোন নীতিমালা বা পরিপত্র সংশোধন হতে পারে। কিন্তু তা যদি প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই ভাবতে হবে।

[লেখক : সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার]